নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার

পৃথিবীব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতা একটি উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সহিংসতা নারীর স্বাস্থ্যের জন্যেও হুমকিস্বরূপ। সহিংসতার ফলে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সহিংসতা (শারীরিক, মানসিক, যৌন, ভয় দেখানো) ব্যক্তির মধ্যে ট্রমার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে; সে ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে ওঠে, অসহায় বোধ করে। ট্রমার অভিজ্ঞতার পর ব্যক্তি তীব্র মানসিক চাপ বোধ করে এবং সব সময় বিপদজনক কিছু ঘটবে বলে আশঙ্কা করে। অনেক ব্যক্তি, যারা এ ধরনের ট্রমার শিকার হয়, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু, যারা ট্রমার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না তাদের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা যায়। নারীর প্রতি সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত একটি মানসিক রোগ হলো পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি)।

পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হচ্ছে ট্রমার অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট কতগুলো উপসর্গ বা এমন একটি পরিস্থিতি যা যৌন নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, তীব্র মানসিক আঘাত, মৃত্যুভয় ইত্যাদির মতো ট্রমাটিক অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ট্রমাটিক ঘটনা ঘটার পরপরই দেখা দেয় না। ট্রমাটিক ঘটনা ঘটার প্রায় তিন মাস পর এর লক্ষণ দেখা দেয়। অন্যকে সহিংসতার শিকার হতে দেখলেও ব্যক্তির মধ্যে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নারীর পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তবে সহিংসতার শিকার সব নারীর এই ডিসঅর্ডার হয় না। ব্যক্তির মধ্যে কিছু বিষয়ের উপস্থিতি - যেমন, ট্রমার ঘটনা ঘটার আগে তার জীবনযাত্রার ধরন, আগে তার কোন মানসিক সমস্যা (বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা) ছিল কিনা, ট্রমা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা, ট্রমার পরিস্থিতিটা কতটুকু ভয়াবহ ছিল, কী ধরনের ট্রমার সম্মুখীন হয়েছে, কোন শারীরিক আঘাত আছে কিনা, ট্রমা ছাড়াও অন্য কোন বিষয়ে মানসিক চাপ আছে কিনা, সমাজ, পরিবার আর মানসিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে এমন পেশাজীবিদের কাছ হতে কী ধরনের সহায়তা সে পাচ্ছে ইত্যাদি তাকে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ করে।

পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হচ্ছে ট্রমার অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট কতগুলো উপসর্গ বা এমন একটি পরিস্থিতি যা যৌন নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, তীব্র মানসিক আঘাত, মৃত্যুভয় ইত্যাদির মতো ট্রমাটিক অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে।

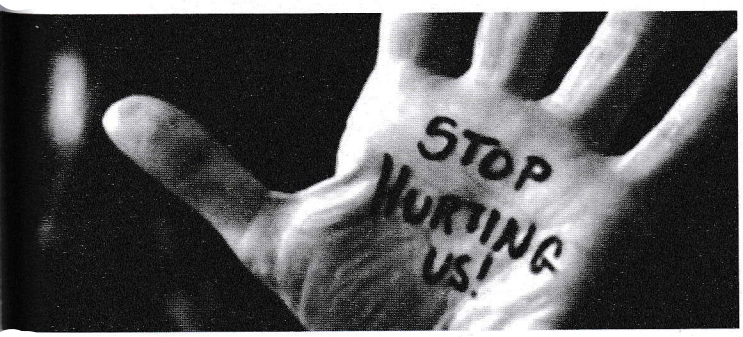

পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এর লক্ষণ হঠাৎ করে দেখা যেতে পারে, আবার ধীরে ধীরে, একবার আসে আবার চলে যায়, এভাবেও লক্ষণগুলো আসতে পারে। অনেক সময় সহিংসতার ঘটনার সাথে যুক্ত কিছু বিষয়, যেমন শব্দ, গন্ধ, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদির কারণে লক্ষণগুলো উপস্থিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্নভাবে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এর লক্ষণের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই লক্ষণগুলো মূলতঃ তিন ধরনের:

ক) ট্রমার ঘটনার পুনঃঅভিজ্ঞতা:

১) বিপর্যস্ত স্মৃতি বা ট্রমার কল্পনা বা চিন্তা করা

২) ট্রমার ঘটনা আবার ঘটতে যাচ্ছে এমন মনে করা (ঘটনাটি আবার ঘটছে এমন অনুভব করা)

৩) দুঃস্বপ্ন (ট্রমার ঘটনাটি বা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে) দেখা

৪) ট্রমার ঘটনার কথা মনে করে বিচলিত বোধ করা

৫) নানা ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া হওয়া (বুক ধড়ফড় করা, ঘনঘন শ্বাস পড়া, বমিবমি ভাব, ঘাম)

খ) এড়িয়ে চলা:

১) যেসব কাজ, জায়গা, চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ট্রমার কথা মনে করিয়ে দেয় তা এড়িয়ে চলা

২) ট্রমার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় মনে করতে না পারা

৩) কাজকর্ম এবং জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা

৪) অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া

৫) ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা (স্বাভাবিক জীবন যাপনে অনিশ্চয়তা, বিয়ে, পেশাগত জীবন)

৬) আবেগশূন্য হয়ে যাওয়া

গ) দুঃচিন্তা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে অপারগতা:

১) অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা

২) বিরক্তি

৩) রাগ নিয়ন্ত্রণে অপারগতা

৪) মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটা

৫) সব সময় উত্তেজিত থাকা

৬) বিপদের আশঙ্কা করা

৭) সহজে চমকে ওঠা

৮) বিপদজনক কিছু ঘটবে বলে দুশ্চিন্তা করা

পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এর লক্ষণ কমাতে ওষুধের ভূমিকা কার্যকর। এই ডিসঅর্ডার-এর চিকিৎসায় পরিবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ট্রমার ঘটনার পরপরই ট্রমার শিকার ব্যক্তির সহায়তা করা যায় তাহলে তার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

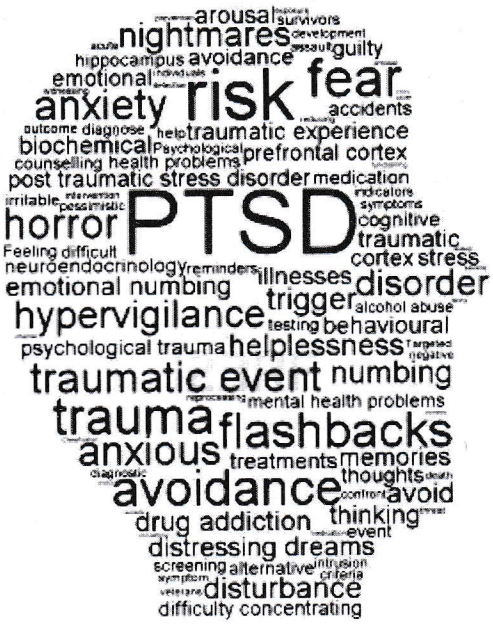

যে ব্যক্তি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এ আক্রান্ত তার চিকিৎসা প্রয়োজন। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এর চিকিৎসায় নানা ধরনের সাইকোথেরাপি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, ট্রমা ফোকাস কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, এক্সপোজার থেরাপি, স্ট্রেস ইনোকুলেশন ট্রেনিং ইত্যাদি। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এর লক্ষণ কমাতে ওষুধের ভূমিকা কার্যকর। এই ডিসঅর্ডার-এর চিকিৎসায় পরিবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ট্রমার ঘটনার পরপরই ট্রমার শিকার ব্যক্তির সহায়তা করা যায় তাহলে তার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আর, যদি এই ডিসঅর্ডার দেখা দেয় এবং পরিবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সহায়তা করে ও চিকিৎসা করা হয়, তবে ব্যক্তি এই সমস্যা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসতে পারে।

ইশরাত শারমীন রহমান
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ঢাকা